ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ৭৭-৯০
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4215

হেনরি বেভারিজের বর্ণনায় বাকেরগঞ্জের (বরিশালের) আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গ

ড. মো. আবুল বাশার
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Bakerganj was a vibrant region in eastern Bengal, enriched by the abundant freshwater rivers that lead to the Bay of Bengal, making it a truly remarkable and prosperous area. *The District of Bakerganj: Its History and Statistics* by British administrator Henry Beveridge serves as a significant primary source for understanding the socio-economic history of this region. This paper examines the agro-craft economic development of this land, highlighting the geostrategic location's role in achieving economic independence for each farmer's family. This sort of economic stability clearly empowered the people of the region to lead peaceful lives, despite the challenges posed by natural disasters that obstruct economic development. It decisively highlights how the British administration of the land systematically impoverished the region, mirroring the effects seen in other parts of the country and the subsequent development under colonial rule including importing western education. Henry Beveridge's historical account offers a comprehensive overview of the socio-economic conditions in Bakerganj, which is a significant part of the history of Bangladesh.

Key Words: Agro-craft Economy, Geo-strategic Location, Socio-economy, British Administration.

ভূমিকা: ব্রিটিশ শাসিত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অন্যতম প্রাচ্যবিদ হিসেবে পরিচিত হেনরি বেভারিজ (১৮৩৭-১৯২৯) তৎকালিন বাংলার (ভারত শাসিত পশ্চিম বঙ্গ ও আধুনিক বাংলাদেশের) ঢাকা, চট্টগ্রাম, বাকেরগঞ্জ (আধুনিক বরিশাল) ফরিদপুর, রংপুর, সিলেট, পাবনা, মুর্শিদাবাদসহ বিভিন্ন জেলার জেলা জজ, সেশন জজ ও কালেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে তিনি বাংলার সভ্যতা, সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন যার উজ্জল দৃষ্টান্ত *The District of Bakarganj: Its History and Statistics* (1876)। এ গ্রন্থটি হেনরি বেভারিজের বাকেরগঞ্জের ৫ বছরের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের আলোকে ইন্ডিয়া অফিস ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত যা এই অঞ্চলের ইতিহাস অনুসন্ধানীদের নানা প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ১৮৫৭ সনের শেষের দিকে হেনরি বেভারিজ প্রথমে ইন্ডিয়ায় ও ১৮৫৮ সনের শুরুতে বাংলায় আসেন যখন এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলমান ছিল যা সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খ্রিস্টধর্ম সম্প্রসারণকে

কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ শাসন অবসানের সুত্রপাত হয় যা এই অঞ্চলের মানুষকে অধিকার সচেতন করে দেয় যা পরবর্তিতে ব্রিটিশ শাসনের জোয়ালকে উপড়ে ফেলে স্বায়ত্ব-শাসন ও স্বাধীনতা ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে মি. বেভারিজ মনে করেন। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে হেনরি বেভারিজ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ হতে তৎকালিন ঐতিহাসিক বাকেরগঞ্জ জেলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের মাধ্যমে তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

হেনরি বেভারিজের পরিচয়: হেনরি বেভারিজ ১৮৩৯ সনে স্কটল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন এবং Royal Circus School এ পড়াশুনা শুরু করেন যা ক্রমান্বয়ে Edinburgh Academy ও University of Glasgow-তে অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন। ১৯৫৭ সনে Indian Civil Service (ICS) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে একই বছর ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া শাসিত ভারতে আসেন এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন।[১] ১৮৫৮ সনে কলকাতা পৌঁছে তিনি প্রথমে ময়মনসিংহ জেলার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই দায়িত্ব তিনি পর্যায়ক্রমে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় পালন করেন যেমন, ঝিনাইদহ (১৯৬১), যশোর (১৯৬২), নদীয়া (১৯৬২), মেদিনীপুর (১৯৬৩), সিলেট (১৯৬৩)। এরপর তিনি মনিপুরে পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য এক বছর অতিবাহিত করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি যুগ্ম ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ধারাবাহিকভাবে ঢাকা, নোয়াখালি, হুগলী, চট্টগ্রাম ও বরিশালে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দেন।

১৮৭৫ সনে তিনি বিচার বিভাগে যোগদান করে পরবর্তি বছর রংপুরের সেশন জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই দায়িত্ব তিনি পাবনা, চব্বিশ পরগনা, ফরিদপুর, বিরভূম, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাসমূহে পালন করেন। অতপর, তিনি ১৮৯৩ সনে অবসরে যান এবং ইংল্যান্ডের Hazlemere এ অবস্থান করেন যদিও তিনি ১৮৯৯ সনে মোঘল ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য পুনরায় ভারত এসেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তিনি ১৮৯০-১৮৯১ সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটি (বেঙ্গল) এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি *The District of Bakerganj: Its History and Statistics*, (London: Trubner & Co., 1876), *The Trial of Maharaja Nanda Kumar: A Narrative of Judicial Murder*, (Calcutta: Thacker Spink and Co., 1886) সহ *তুজুকই জাহাঙ্গীরী*, *আকবরনামার* ১,২,৩ তম খন্ড অনুবাদ করেন। দীর্ঘ (১৮৫৮-১৮৯৩) ৩৫ বছর কর্মের সুবাদে বাংলায় অবস্থানের কারনে হেনরি বেভারিজ এ অঞ্চলের সমাজ, রাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান অর্জন করেন যা নিম্নোক্ত বিবরণ হতে অনুধাবন করা যায়:

> Henry was thus a pioneer of that line of civil servants chosen not by nepotism but on their academic merits, seeking not wealth but

> to serve their country in the best interests of India, who for nearly a hundred years won the laurels they deserved. He was close enough to the tradition which the new regime had been created to abolish to be well aware of how necessary the reform had been. For him and his contemporaries.[২]

হেনরি বেভারিজপূর্ব বাকেরগঞ্জঃ মোঘল বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ৪টি মহল নিয়ে গঠিত সরকার বাকলার মধ্যে বাকেরগঞ্জ অন্যতম।[৩] মোঘল সভা ইতিহাসবিদ আবুল ফজলের (১৫৭৯-১৬০২) বর্ণনামতে সরকার বাকলা সমুদ্র তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি যা সরকার খলিফাতাবাদ নামে পরিচিত। মোঘল সম্রাট (১৫৫৬-১৬০৫) মহামতি আকবর তার রাজত্বকালের ২৯ তম বছরে তথা ১৫৮৪ সনে রাজা পরমানন্দ রায়কে পরাজিত করে এ অঞ্চল জয় করেন। সরকার বাকলার একটি দূর্গ সমুদ্র তীরে অবস্থিত যার চারিপাশে ছিল ঘন বন।[৪] সিয়ারুল মুতাআখেরনের বর্ণনায় বাকলাকে বাঘলা, হোগলা নামে দেখা যায়। হতে পারে এই অঞ্চলে বাঘের প্রাদূর্ভাব ও হোগলা পাতার প্রাচুর্যতার কারনে তিনি এ নামের ব্যবহার করেছেন। ইউরোপীয় পর্যটক রালফ ফীচ বাকেরগঞ্জকে পাললিক ব-দ্বীপের একটি সাধারণ অংশ যা এই অঞ্চলের ৩টি খরস্রোতা নদীর বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত বলে উপস্থাপন করেছেন।[৫]

হেনরি বেভারিজের বর্ণনায় বাকেরগঞ্জের পরিচয়ঃ বাকেরগঞ্জ নামটি আগা বাকেরের নামানুসারে নাম করণ করা হয়েছে যিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের নওয়াবের একজন কর্মচারী। তিনি ছিলেন বুজুর্গ উমেদপুর ও সেলিমাবাদের অধিকাংশ স্থানের মালিক। উমেদপুরে তিনি একটি হাট বা গঞ্জের স্থাপন করেছিলেন যা তৎকালিন সময়ে এ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং এর পর হতে এটি বাকেরগঞ্জ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৬] এ জেলার অধিকাংশ ভূমি সুগন্ধা নদীর পলি দ্বারা গঠিত যা পূর্বে বাকলা নামে পরিচিত ছিল। এ জেলাটি বারো ভূইয়াদের অন্তর্গত একটি হিন্দু পরিবার দ্বারা শাসিত হত যারা চন্দ্রদ্বীপের রাজা বলে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ বণিক ও পর্যটক মি. রালফ ফিচ (১৫৫০-১৬১১) ১৫৮৬ সনে বাংলার ভ্রমণ বিবরণীতে এ অঞ্চলকে বাকলা বলে উল্লেখ করেছেন, খাদ্যে ও বস্ত্রে (সূতি ও রেশম) এটি ছিল পরিপূর্ণ। সম্পূর্ণ সমতল ও নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এ জেলায় বছরে দুই-তিনবার ফসল ফলে। ফসল উৎপাদনের জন্য মি. বেভারিজ এ জেলাকে ম্যানচেষ্টারের তুলনা করলেও এখানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প ও কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা প্রাচীন কোন স্থাপনার জন্য বিশেষ কোন খ্যাতি নেই বলে মনে করেন।[৭]

নৌকা এ অঞ্চলের লোকজনের চলাচলের এবং ভারি ও ভঙ্গুর দ্রব্যাদির পরিবহনের লাভজনক ও কার্যকরী বাহন যার গতি বাতাস ও নদীর জোয়ারের উপর নির্ভর করে। এ বাহনের নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এটিই এই অঞ্চলের সৌন্দর্য। তিনি বিবরণ দিয়েছেন দিগন্ত জোরা বিস্তির্ণ সবুজ ধান ক্ষেতের যা কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যতিতই এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। একইভাবে তিনি প্রবাহমান নদীর অপরুপ সৌন্দর্যের

বর্ণনাও দিয়েছেন যে কারণে মুসলমান শাসকবৃন্দ এ অঞ্চলকে "Paradise of the Countries" বলে অভিহিত করেছেন।[৮] তিনি এ অঞ্চলের কৃষকের বসতবাড়িকে একেকটি খামার বাড়ি হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন যার চারিপাশে নানা ধরণের ফলফলাদির (আম, কাঠাল, তাল ইত্যাদি) গাছসহ কাঠের গাছ (বাঁশ ও অন্যান্য), উপচে-পড়া ধান ক্ষেত দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রত্যেকটি বাড়ি একটি হতে অন্যটিকে ফিতার মতো পৃথক করেছে তার সবুজ বৃক্ষ ও খননকৃত পরিখা যা বসতবাড়ি নির্মানে খনন করা হয়েছিল। এ জেলার একটি বাড়ি হতে আরেকটি বাড়ি যেমন পৃথক তেমনিভাবে একটি গ্রাম হতে আরেকটি গ্রামও পৃথক বা ভিন্ন। গ্রামের বাড়িসমূহ একটি জীবন্ত দেয়াল যার কান্ড ও পল্লব চুন-সুরকির বিকল্প হিসেবে কাজ করেছে, এ পত্র-পল্লবের উপর পতিত সূর্যের কিরণ ও চাদের আলো এক অপরুপ দৃশ্যের অবতারণা করে। তিনি এ অঞ্চলের কৃষকের ভগ্ন দেহাবয়বেরও বিবরণ দিয়েছেন।[৯]

কোম্পানি শাসিত বাংলার ঢাকা বিভাগের ৪টি কালেক্টরেটেরের মধ্যে বাকেরগঞ্জ (আধুনিক বরিশাল) অন্যতম জেলা যার উত্তরে ফরিদপুর, পশ্চিমে ফরিদপুর ও বলেশ্বর নদী (বরিশাল ও যশোরকে বিভক্তকারী নদী), দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পূর্বে মেঘনা ও তার শাখা নদীসমূহ। তৎকালিন সময়ে এ জেলার আয়তন ছিল ৪৩০০ বর্গ কি. মি. যা ব্রিটেনের ওয়েলসের (৭৩৯৭ বর্গ কি. মি.) অর্ধেকেরও বেশী। ১৮৭২ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ জেলার লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮,৭৮,১৪৪ যার দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান অর্থাৎ মুসলমান ১২৫৪৪২৯ জন, হিন্দুরা ৬১৫২৬৯ জন, বৌদ্ধ ৪০৪৯ জন, ও খ্রিস্টান ৩২৬৪ জন।[১০] ১৭৯৭ সনের আইনের ৭নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে বাকেরগঞ্জ একটি জেলা হিসেবে স্বিকৃতি পেলেও ১৮১৭ সন পর্যন্ত এটি কালেক্টরেটের মর্যাদা পায়নি। এ সময় বরিশাল ছিল এই জেলার প্রধানতম শহর যেখানে ছিল বিচারিক আদালত। এ জেলার ধার্যকৃত রাজস্ব ছিল ১৬ লাখ রুপি, আদায় হত প্রায় ১৩ লাখ ৭০ হাজার আর প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ খরচ হত প্রায় ৩ লাখ রুপি।[১১]

বাকেরগঞ্জ জেলার আর্থিক ইতিহাস: মি. হেনরি এ জেলার আর্থিক ইতিহাস বর্ণনার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে মি. গ্রান্ট যে অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ (*Analysis of the Finance of Bengal*)[১২] দিয়েছিলেন তার আলোকে বর্ণনা করেছেন। এখানে দেখিয়েছেন যে মোঘল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) অর্থমন্ত্রী রাজা টোডরমলের (১৫০০-১৫৮৯) ১৫৮২ সনের বন্দোবস্ত অনুযায়ী এ জেলার অধিকাংশ সরকার বাকলার (মোঘল সাম্রাজ্যের খাস জমি নিয়ে গঠিত ১৯টি সরকারের মধ্যে অন্যতম প্রশাসনিক ইউনিট) অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ পরগনার অধিভূক্ত ছিল। তৎকালিন সরকার বাকলা ৪৭ টি পরগনা নিয়ে গঠিত ছিল যার মধ্যে ৪টি মহল বা পরগনা ছিল বৃহৎ যেমন: ১. ইসমাইলপুর বা বাকলা, ২. শ্রিরামপুর, ৩. শাহজাদপুর ও ৪. আদিলপুর। এ সময় বাকলাকে বলা হত বাখলা-চন্দ্রদ্বীপ। চার্লস গ্রান্ট এ জেলা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে 'the whole sarkar now described was overwhelmed and laid waste by an

inundation, and from the succeeding ravages of the Mugs continues to this day in great part depopulated.'

এ সময় উল্লেখিত ৪ পরগনার বার্ষিক রাজস্ব ছিল ১,৭৮,২৬৬ সিক্কা। ১৭২২ সনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বাকলাকে জাহাঙ্গিরনগরের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৭২৮ সনে সুজাউদ্দৌলা এটিকে ইহতিমাম বা জমিদারিতে বিভক্ত করেন এবং তখনো এটি ঢাকার অর্ন্তভূক্ত থাকে।[১৩] ১৭৯০ সনের দশসনা বন্দোবস্তের (পরবর্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) বাকেরগঞ্জ জেলাকে ঢাকা জালালপুর[১৪] কালেক্টরেটের অধিভূক্ত করা হয় তখন মি. ডগলাস কালেক্টরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই বন্দোবস্তের আলোকে মোঘল আমলের জমিদারিকে ছোট ছোট তালুকদারীতে বিভাজন করা হয়, বলা হয়ে থাকে এ সময় এখানে ৩২৩২ টি তালুকদারি সৃষ্টি করা হয়েছিল তবে এ সকল তালুকের মধ্যে ৫০ টি কোন রকমের রাজস্ব আরোপ হতে মুক্ত থাকত।[১৫] এ প্রসঙ্গে মি. বেভারিজ বলেন: 'There is no probably no other district in Bengal proper where Government has so many and such valuable estates and therefore we may say there is no other district in which government has so large and direct an interest.'[১৬] এ জেলায় সরকারি তত্ত্বাবধানে ৪টি ফিশারি পয়েন্ট ছিল (১) জাহাপুর ফিশারি, (২) মেঘনা ফিশারি, (৩) বিশখালি ফিশারি, এবং (৪) ভাসান তিতুলিয়া ফিশারি। এ ফিশারিসমূহ হতে বার্ষিক ১০২৯ রুপি রাজস্ব আদায় হত।[১৭]

এ জেলায় ১০১ টি জমিদারি গণনা করা হলেও জমিদারদের সংখ্যা ছিল ৪/৫ গুণ বেশী যার অধিকাংশ ছিল ব্রাহ্মণ হিন্দু এবং অল্প সংখ্যক মুসলমান, তবে পূর্বের চিত্র ছিল ভিন্ন। ভূমি ব্যবহারকারীদের মধ্যে সবথেকে উচ্চ শ্রেণি ছিল জমিদার বা স্বাধীন তালুকদার যারা সরকারকে রাজস্ব প্রদান করত এবং সরকারি বিধি দ্বারা পরিচালিত হত। এরপরে যথাক্রমে ছিল আওসাত তালুকদার, হাওলাদার, নিমহাওলাদার, কারসাদার।[১৮] এ জেলার দ্বীপে প্রায় ৪৫০০ বসতি থাকলেও জমির মালিকানা ভোগের জন্য অনুরুপ বিশেষ ৪টি শ্রেণি ছিল (১) আবাদকার অথবা তালুকদার (এ জমিদারগণ সরকার নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করত), (২) হাওলাদার, (৩) নিমহাওলাদার, (৪) কারসাদার (বর্গা চাষী) বা সাধারণ কৃষক। এ জেলার চাষাবাদের অযোগ্য ভূমিকে বিশেষ করে জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি প্রান্তিক চাষিদেরকে ২/৪ আনা রাজস্ব প্রদানের শর্তে চাষাবাদের জন্য লিজ নিতে পারতেন যা হাওয়ালা নামে পরিচিত ছিল। উল্লেখ্য যে এ প্রান্তিক চাষীগণ ১০/১২ জনের একেকটি গ্রুপ গঠন করে চাষাবাদ করত, এটি ক্লাব নামে পরিচিত ছিল। এ চাষীগণ প্রথমে সম্মিলিতভাবে জমি পরিষ্কার করে চাষাবাদ শুরু করতেন, এরা ছিলেন মূলত নিমহাওলাদার এবং কারসাদার।[১৯]

একজন চাষী ৪০ হতে ৪৫ বিঘার অতিরিক্ত ভূমি আবাদ করতে পারতেন না তবে অনাবাদী ভূমি (জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি) উল্লেখিত পরিমাণের ২ হতে ৪ গুণ বেশী গ্রহণ করতে পারতেন। একইভাবে অনেক সময় একজন তালুকদার নিজ জমিদারিতে অধিনস্তদের

তথা আওসাত তালুকদার, হাওলাদার ও কারসাদারদের অধিকারসমূহ (একই ব্যক্তি তিন বা চার শ্রেণির ভূমি অধিকার ভোগ করতেন)। এছাড়াও একজন তালুকদার নিজেই হাওলাদার অথবা কারসাদার হিসেবে রাজস্ব প্রদান করছে আবার জমিদার হিসেবে হাওলাদার অথবা কারসাদারদের হতে রাজস্ব গ্রহণ করছে যা একটি জটিল হিসেবের অবতারণা করেছিল। এ প্রসঙ্গে মি. হেনরি মন্তব্য করেন যে, 'Nor is the system so superfluous or irrational as it at first sight appears. It arises in a great measure from the subdivision of property and from the fact of many estates being held jointly i.e. ijmaili'.[২০] এভাবেই এক ব্যাক্তি ২ অথবা ৩ বা সাড়ে তিন আনা জমিদারির অংশিদার হত এবং সৃষ্টি হত তালুক বা হাওয়ালার তবে অংশিদারকেই নিজ নিজ অংশ মোতাবেক রাজস্ব প্রদান করতে হত। কোর্টের মাধ্যমে তালুকে বিদ্যমান অন্যের অংশ ক্রয়ের মাধ্যমে পূর্ণ তালুকের মালিক হওয়ার প্রথা বিদ্যমান ছিল। এ বিষয়টি নিয়ে কোর্টের ভিতরে-বাহিরে জমিদারদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জিম্বা বা জিম্বাদার জমিদার ও রায়তের মাঝে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করত।[২১]

বাকেরগঞ্জ জেলায় সামান্য (২৩টি) কিছু রাজস্ববিহীন বা লাখারাজ (Rent free land) ভূমি ছিল যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল, সরকারি রেকর্ড রুমের তথ্য মতে এ জমির সংখ্যা ছিল ১১৪৩ টি। মাঝে মাঝে সরকার এ সকল ভূমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করলে জমি ব্যবহারকারীগণ ১ রুপি রাজস্ব প্রদান শুরু করেছিল। এ সকল ভূমির অধিকাংশই ছিল ব্রহ্মোত্তর যা হিন্দু ধর্মের পুরোহীতদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হত। যদিও এ জেলায় মুসলমান ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, এ ভূমির বেশিরভাগ ছিল চন্দ্রদ্বীপে।[২২] পরিসংখ্যান অনুযায়ী ধর্মের অনুসারি হিসেবে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সংখ্যাগত পার্থক্য থাকলেও মি. হেনরি সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠিকে বাঙ্গালি হিসেবেই মূল্যায়ন করে মন্তব্য করেন যে; 'They were Bengalis before they were Hindus or Mohamadans; as regards the world in general, the most important fact about them is that they belong to the Bengali race; and as regard Bengal that they are natives of Bakarganj.'[২৩] প্রত্যেক ধর্মের অনুসারিদের (মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান) জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যা তারা খুবই আন্তরিকতার সাথে পালন করে থাকে। তবে পশ্চিমাদের প্রভাবে ধর্মীয় কুসংস্কার রোহিতের বিষয়টি তিনি ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যেমন সতীদাহ প্রথা। একইসাথে মুসলিম নারীদের পর্দা প্রথা বিষয় ও তাদের স্বামীর প্রতি ভক্তি প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন।[২৪]

বাংলার অন্যান্য জেলার মত এ জেলাটি বিদেশি আক্রমণ হতে মুক্ত থাকায় পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ হতে আগত লোকদের নিয়েই এই জেলার জনবসতি গঠিত হয়েছে এবং তাদের আচার-আচরণে বিদেশি প্রভাব মুক্ত খাঁটি বাঙ্গালিয়ানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

উচ্চ শ্রেণির লোক খুব কমই এ জেলায় বাস করত, পেশাদার, বণিক, দোকানদার শ্রেণি মূলত বাইরের মানুষদের দ্বারা গঠিত ছিল। আয়ের দিক থেকে এ জেলায় এমন একজনও পাওয়া যাবে না যার বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা (১,০০,০০০)। এমনকি এমন ১০ জনও পাওয়া যাবেনা যাদের আয় একজন জেলা জজের সমান। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে কর অব্যহতির মাত্র যখন ৭৫০ টাকা ছিল তখন সম্পূর্ণ জেলায় কর নিরুপনযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫৬৭ জন। এ কর অব্যহতির মাত্রা যখন ১০০০ টাকায় পরিণত হয় তখন কর নিরুপন যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা হয় মাত্র ৮৪৭ জন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পটুয়াখালির ৪,০০,০০০ জনবসতির মধ্যে মাত্র ৮৪ জন কর নিরুপনযোগ্য ব্যক্তি ছিল যখন কর অব্যহতির মাত্রা ছিল মাত্র ৭৫০ টাকা, মাত্র ৩০ জন ব্যক্তি ছিল যাদের সম্পদ ছিল মাত্র ১০০ ডলারের সমপরিমান।[২৫]

এ সময় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাকেরগঞ্জে চাহিদা ও অভাব দু'টোই খুব সামান্য ছিল কেননা এখানের ভূমি ছিল খুবই উর্বর, কৃষক ছিল ডাকসেটে বিলাসি। এদের ছিল প্রচুর চাল, নদী, খালে-বিলে প্রচুর মাছ ধরতে পারত, বাগানে ছিল নারকেল, সুপারী, কলা ইত্যাদি। ফলে তাদের লবণ ও পোষাক ব্যতিত তেমন কিছুই ক্রয় করতে হত না। এই অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে মি. হেনরি পর্যটক গ্রান্ড প্রি এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন ‘There the richest is poor and the poorest lives in abundance.’ এ সমৃদ্ধির জন্য মি. হেনরী দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন (ক) জমির মালিকানার অনুভূতি (খ) উৎপাদনের স্বাধীনতা। এই প্রাচুর্যতা, জীবনি শক্তি ও কর্ম চাঞ্চল্য এ দূর্গম অঞ্চলের মানুষকে এনে দিয়েছিল এক নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য বাঙ্গালীদের ন্যায় এ জেলার মানুষও বন্ধুপ্রতিম, সহনশীল, দানশীল, অতিথিপরায়ন। জেলার মানুষদের একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো পরিচালকদের সাথে খুবই বন্ধু সুলভ আচরণ করে যেমন এক সাথে গল্প করা, খাওয়া-দাওয়া করা ইত্যাদি।

উৎপাদন: ধান এ জেলার প্রধান উৎপাদিত খাদ্যশষ্য যার রয়েছে নানা ধরণের জাত, এর মধ্যে আমন অন্যতম যা বাকেরগঞ্জের প্রায় সর্বত্রই সবথেকে বেশি আবাদ করা হয় বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে। এ জেলার উত্তরে ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে আমন চাষাবাদ শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বরের শুরুতে দক্ষিণে চাষ শুরু হলেও এপ্রিল ও মে মাসে প্রধানত চাষাবাদ শুরু হয়। তবে অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে বন্যা একটু আগে শুরু হওয়ায় চাষাবাদও আগে শুরু হয় যেমন গৌরনদী থানা ও আড়িয়াল খাঁ নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এ চাষাবাদের জন্য গরু ও মহিষ ব্যবহার করা হয়। এ জেলার তিন-চতুর্থাংশে আমন চাষাবাদ হলেও বাকী অংশে আউশ (বপন করা হয় মার্চ-এপ্রিল বা চৈত্র-বৈশাখ, ফসল ঘরে আসে জুলাই-আগস্ট) ও বোরোর (বপন করা হয় ডিসেম্বর-জানুয়ারী এবং সংগ্রহ করা হয় এপ্রিলে) চাষাবাদ হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে ধান ঘরে আসার পরে হিন্দু মুসলমান সকলেই নবান্ন উৎসব পালন করে, এসময় অনেক আত্মীয়-স্বজন একত্রিত হয় তবে এটি বাকেরগঞ্জের জন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রতি বিঘা (এক একরের

তিনভাগের এক ভাগ) জমিতে ৬ হতে ১০ মণ ধান উৎপন্ন হত। এ ধান কাটার জন্য ফরিদপুর ও উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহ হতে ধান কাটার দল আসত যারা ধান কেটে জমির মালিকের বাড়ি পৌঁছে দিত, বিনিময়ে মোট কাটা ধানের সাধারণত এক-পঞ্চমাংশ লাভ করলেও কখনো কখনো এক-ষষ্টাংশও পেত তবে পূর্বে এটি এক-চতুর্থাংশ ছিল। ধান কাটা শেষে এ সকল চাষি আহরিত ধান নৌকা ভরে নিজ অঞ্চলে নিয়ে আসত।[২৬]

অন্যান্য জেলার ন্যায় এ জেলায়ও পরিমাপ করে উৎপাদিত ধান বিক্রি করা হত তবে এ জেলার পরিমাপ ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র যা সাহেবগঞ্জ বা বাকেরগঞ্জ পরিমাপ বলে পরিচিত ছিল। এটি প্রচলিত পরিমাপ ব্যবস্থা হতে ছিল বড় তথা ৯৬ তোলা=১ সের হত, এ জেলার ৩০ সের অন্য জেলার এক মণ বা ৪০ সের হত। বাকেরগঞ্জের ধানের অনেক সুনাম ছিল যা পাইকার বা মধ্যস্বত্ত্বভোগিগণ বাড়ি বাড়ি ঘুরে বা স্থানীয় বাজার হতে ধান ক্রয় করতো। এ সময় দু' ধরনের পাইকার বা মধ্যস্বত্ত্বভোগি দেখা যেত; ১. বড় পাইকার ২. ছোট পাইকার। পূর্বে বড় পাইকারকে আড়ৎদার বা দালাল বলা হত, প্রধান বাজারসমূহে তাদের অফিস থাকতো। ক্রয়কৃত ধান এ সব বড় পাইকার বড় নৌকা বা শিপ ভর্তি করে কলিকাতা নিয়ে যেত। ছোট পাইকারদের বলা হত ফরিয়া যাদের ব্যবসা ছিল ফইরামি। এরা সাধারণত বাড়ি এবং ছোট ছোট হাট (স্থানীয় বাজর) হতে এক স্থানে স্তূপ করে একত্রে কলকাতা পাঠাতো। এ ছাড়াও বাকরগঞ্জের উৎপাদিত ধানের ভালো একটি অংশ বিনিময় পদ্ধতির (Barter) মাধ্যমে হস্তান্তরিত হত। বিশেষ করে ঢাকা হতে আগত মৃৎশিল্পের পাত্র বোঝাই নৌকাগুলো এ জেলায় আসত এবং ধানের বিনিময়ে পণ্য বিক্রি করে নৌকা ভর্তি ধান নিয়ে নিজ এলাকায় ফিরে যেতো। এ অঞ্চলে মাটির পাত্রের অধিক চাহিদার কারণ সম্পর্কে মি. হেনরি বলেন:

> The reason why this trade in pots is so brisk is that the Bakarganj earth is in general saltish and not suitable for pottery, and therefore the inhabitants have to depend on other districts for their supply of pots for household purposes and for the making of molasses.[২৭]

মি. হেনরির এ সময়ের ধানের মূল্যের নিম্নোক্ত বিবরণ দেন:

৩ (তিন) মণ	১ রুপি
৪ (চার) মণ	১ রুপি (ইদিলপুরে)
১ (এক) মণ	১ রুপি
১৭ সের	১ রুপি (১৮৭৫ সনে)

তথ্যসূত্র: H. Beveridge, *op., cit.*, 252-253.

বাকেরগঞ্জের উৎপাদিত খাদ্যশষ্যের মধ্যে ধানের পরেই সুপারির স্থান যা জেলার দক্ষিণ শাহবাজপুর, উত্তর ও পূর্ব অংশে বেশ ভালো জন্মাতো। বাকেরগঞ্জের প্রায় প্রতিটি বাড়ির আঙ্গিনায় সুপারি গাছ দেখতে পাওয়া যেত, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বাড়িতে যারা সুপারি বিক্রির আয় হতে সংসার পরিচালনা করতো। অক্টোবর হতে শীত কাল

পর্যন্ত সুপারি সংগ্রহ ও ব্যবসা চলত। দৌলতখান, মেহেন্দীগঞ্জের লালগঞ্জ ও নলছিটি সুপারি উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিপুল সংখ্যক মগ, আরাকান বার্মিজ ও কিছু সংখ্যক চৈনিক বণিক শীত কালে সুপারি ক্রয়ের জন্য নলছিটিতে আসতো । বিশেষ করে শীতকালে নলছিটির এক-চতুর্থাংশ মগ ও তাদের নৌকা (বালাম) দ্বারা বেষ্টিত থাকতো এ কারণে এই এলাকা মগপাড়া নামে পরিচিত ছিল। মাঝে মাঝে নলছিটি হতে সরাসরি নৌকাযোগে চট্টগ্রাম ও আরাকানে সুপারি পরিবহন করা হত এবং সেখান হতে কলকাতা পাঠানো যেতো। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণের উদ্দেশ্যে ও চাহিদা অনুযায়ী তিনভাবে সুপারি প্রস্তুত করা হত: ১. মুগারি সুপারি: সুপারির খোশা ছাড়িয়ে, পানিতে ভিজিয়ে রেখে, তারপর শুকিয়ে বার্মিজ বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হত। ২. টাটা সুপারি: খোশাসমেত শুকনা সুপারি, ৩. মাগা সুপারি: গুড়া সুপারি। প্রস্তুতকৃত এ সুপারি জাহাজে বোঝাই করে কলকাতা প্রেরণ করা হত যা প্রতি মণ ২০ রুপিতে বিক্রি হত। এ ছাড়াও এ জেলায় যে সকল খাদ্যশষ্য বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হত তার মধ্যে কোকোয়াবাদাম, আখ, কাঠ, হোগলা, পান, শীতল পাটি, চুন অন্যতম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এ অঞ্চলের উৎপাদিত বেশির ভাগ কলকাতা বাজারের জন্য প্রস্তুত করা হত যদিও শত বছর পূর্বে এ জেলাই এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবেই গড়ে উঠেছিল।[২৮]

বাকেরগঞ্জে ইংলিশ প্রশাসন: বাকেরগঞ্জের উপরোল্লিখিত সমৃদ্ধিই ইংরেজদেরকে এই জেলার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত যাওয়ার পর অন্যান্য জেলার মত এ জেলাটিও ইংরেজ ও তাদের নিযুক্ত গোমস্তাদের অত্যাচার হতে রক্ষা পায়নি। এ অত্যাচারের বিবরণ ২৫ মে ১৭৬২ সনের তৎকালিন ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসিত বাংলার গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট (১৭৫৯-১৭৬৪) কে উদ্দেশ্য করে বাকেরগঞ্জের সার্জেন্ট ব্রিগোর নিম্নোক্ত পত্রে দেখা যায়;

> The situation of affairs at this place obliges me to apply to your honour for instructions for my further proceedings… Now, sir, I am to inform you that I have obstructed them in. this place was of great trade formerly but now brought to nothing by the following practices. A gentleman sends a gomastah here to buy or sell; he immediately looks upon himself as sufficient to force every inhabitant either to buy his goods or sell him theirs, and on refusal (in case of non-capacity) a flogging or confinement immediately ensues. This is not sufficient even when willing, but a second force is made use of, which is to engross the different branches of trade to themselves and not to suffer any persons to buy or sell the articles they trade in, and if the country-people do it, then a repetition of their authority is put in practice; and again what things they purchase, they think the least they can do is to take them for a considerable deal less than another merchant, and

> oftentimes refuse paying that, and interfering causes an immediate complaint. This and many other oppressions, more than can be related, which are daily used by the Bengal gomastahs, is the reason that this place is growing destitute of inhabitants. Everyday numbers leave the town to seek a residence more safe, and the very markets which before afforded plenty, do hardly now produce anything of use, their peons being allowed to force poor people, and if the zamindar tries to prevent it, he is threatened to be used in the same manner.
>
> Before, justice was given in the public cutcherry, but now every gomastah is become a judge, and every one's house a cutcherry; they even pass sentences on the zamindars themselves, and draw money from them by pretended injuries, such as a quarrel with some of their peons, or their having, as they assert, stole something, which is more likely to have been taken by their own people; but allowing they were robbed, I believe no gomastah's authority extend so far as to take his own satisfaction on the Government.[২৯]

উপরোল্লিখিত পত্র হতে এই অঞ্চলের বাজার ব্যবস্থায় জনসাধারণের উপর ইংরেজদের অনুগত তথা কথিত Gentleman বা ভদ্রলোকদের নিযুক্ত গোমস্তা কতৃক অত্যাচারের একটি সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় যেমন: স্থানীয়দেরকে গোমস্তাদের পণ্য ক্রয় করতে অথবা নিজেদের পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা। উক্ত কাজে স্থানীয় জন সাধারণ সম্মত না হলে বেত্রাঘাত বা বন্দী করা। এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য স্থানীয় বণিকদের সাথে কৌশলি চুক্তি করা। এ ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধে তারা বিলম্ব করতো বা পরিশোধ করতো না। এ অবস্থায় সাধারণ লোকজন শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে থাকলে বাজার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এই অচলাবস্থা হতে উত্তরণের জন্য গোমস্তাদের পিয়নদেরকে স্থানিয়দের শহরে থাকতে বাধ্য করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ে কৃষক, জমিদার ও গোমস্তাদের নিযুক্ত পিয়নদের মধ্যে প্রায়শই সংঘর্ষ সৃষ্টি হত। এই বিবাদ মিমাংশার জন্য গোমস্তাগণ ব্যক্তিগত কাচারি খোলে এবং নিজেই সে কাচারির বিচারক হয়ে ইচ্ছামত শাস্তি প্রদান আবার সেই শাস্তি মওকুফের জন্য অবৈধ লেনদেনেরও সুযোগ করে দিত।

১৭৮৫ সনের দুর্ভিক্ষ: ১৭৮৫ সনে বাকেরগঞ্জে এক মহা প্লাবন হয়েছিল যার কারণে এ জেলার অধিকাংশ শষ্য ক্ষেত পানিতে ডুবে যায়। জমি চাষাবাদের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে ফলে সৃষ্টি হয় খাদ্য শষ্যের সংকট যা নিয়ে আসে এক মহা দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের ফলে এ অঞ্চলের বহু মানুষ অভুক্ত থেকে খাদ্যের চরম অভাবে প্রায় প্রতিদিনই মারা যেতো। এ বন্যার ফলে এ অঞ্চলের মানুষ প্রথম নদীর উচ্চতা বৃদ্ধির দ্বারা ক্ষতির মুখোমুখি হন; They are the first to feel the effects of the risings of the rivers and they are full of low-lying land and swamps.[৩০] ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক মি.

ডগলাস মনে করেন ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর ১৭৮৭ সালের এই দুর্ভিক্ষ ছিল অত্যন্ত প্রাণঘাতি যার মাধ্যমে বাকেরগঞ্জের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জনবসতির বিলুপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় এ অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লে কোম্পানির রাজস্ব আদয় বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তাবৃন্দ স্থায়ি ভূমি বন্দোবস্তের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে যা পরবর্তিতে দশ সনা বন্দোবস্তে পরিণত হয়।[৩১]

রাজস্ব: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে বাকেরগঞ্জ জেলায় রাজস্ব সংগ্রহের নির্ধারিত কোন পরিমাণ উল্লেখ ছিল না তবে তা নির্ভর করত রাজস্ব সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও রাজস্ব সংগ্রহের বিভিন্ন কলা-কৌশলের উপর। মি. হেনরির বর্ণনায় এ সময়ে রাজস্ব সংগ্রহের কতিপয় খাতের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন:

করের নাম	**করের বিষয়**
জমা-খরচ	বন্দী কর (১০-১২ রুপি) ।
মাহাই	মাছ ধরার কর।
বাজান্ত্রি	সঙ্গীত কর।
দুমারি	পাখি শিকার, বানর নাচ, সর্প নাচ, যাদুকর, ফকির।
মুশরাত কোতয়ালি	কারিগর কর।
পূণ্যা	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদী পালন কর।
পেয়াদা কর	জমিদারী কর
লবণ কর	লবণ উৎপাদকদের অগ্রীম ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হত।

সূত্র: H. Beveridge, *The District of Bakarganj: Its History and Statistics*, (London: Trubner & Co., 1876), 278-285.

বাকেরগঞ্জের যোগাযোগ ব্যবস্থা: বাকরগঞ্জে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সড়ক পথ না থাকলেও এ জেলার প্রশস্ত নদীসমূহ ঢাকা, কলকাতা ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য জেলাসমূহের সাথে যোগাযেগের জন্য মহাসড়ক হিসেবে কাজ করতো এবং জলপথই যাতায়াতের জন্য ছিল অধিক পরিচিত আর বাহন ছিল নৌকা। ফলে দেখা যায় কলিকাতা হতে এ অঞ্চলের দূরত্ব ১৮০ মাইল হলেও এখানে আসতে সময় লাগতো প্রায় ৭ হতে ১০ দিন। এছাড়াও এ জল পথ ছিল কন্টকাকীর্ণ যেমন জলদস্যু, ডাকাত ও নানা হিংস্র প্রাণীর প্রাদূর্ভাব ইত্যাদি।

শিক্ষা: মি. হেনরি এ জেলার ইংরেজি শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৩০ সনে ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্যারেট ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। মি. শেরিং (*History of Protestant Mission*) উল্লেখ করেন, ১৮২৯ সনে সিরামপুর মিশনারির মাধ্যমে এ জেলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ঘটে। মি. স্টুয়ার্ট ১৮৪২ সনে বিদ্যালয়ের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তা সরকারিকরণ হয়। ইংরেজি শিক্ষার জন্য এটি একটি অসাধারণ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় যেখানে প্রতিদিন গড়ে ২৭৮ জন শিক্ষার্থী বিদ্যার্জনের জন্য উপস্থিত হত। এ বিদ্যালয়ের পাশেই ঝালকাঠি হতে ২ মাইল দূরে বাসান্দ গ্রামে একটি স্থানীয় (Vernacular) বিদ্যালয় থাকলেও তা এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না। পরবর্তিতে প্রতিটি ডিভিশনে একটি করে ইংরেজি বিদ্যালয়

(Middle-Class) প্রতিষ্ঠা করা হলেও শিক্ষার চিত্রের তেমন কোন সন্তোষজনক পরিবর্তন ঘটেনি। এ সকল বিদ্যালয়ে যারা পড়াশুনা করত তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল পার্শ্ববর্তী জেলা হতে কর্মের সুবাদে আগত পেশাজিবিদের সন্তানাদি। ১৮৩৫ সনের ৩১ মার্চের পরিসংখ্যান অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে এ জেলায় সর্বসাকুল্যে ৩৬৫ টি স্কুলে ১২১১০ জন বিদ্যার্থি ছিল অর্থাৎ হাজারে মাত্র ৭ জন বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে আসত যাদের মধ্যে হিন্দু ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ কারণঃ 'The Mahomedans chiefly belong to the poorer classes, and are least numerous in the towns and bazars. Something, however, is due to Mahomedan pride and apathy and to their preference for a home education and Arabic studies.'[৩২]

পড়াশুনার জন্য ভাল বিদ্যালয় থাকলেও মেয়ে শিক্ষার শিকড় মজবুত হয়ে গড়ে ওঠেনি যদিও কিছু কিছু বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের একত্রে পাঠদান করানো হত। মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের অন্তরায় হিসেবে ৩টি কারন বিশেষভাবে দায়ি বলে মি. হেনরী মনে করেন; ১. হিন্দুইজম ২. ইসলাম ও ৩. বাল্য-বিবাহ। অতিবৃষ্টিও বিদ্যালয়ে না যাওয়ার অন্যতম অন্তরায়। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ক্রমান্বয়ে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন বিদ্যালয় সমূহকে প্রনোদনা প্রদান করা হয়। কৃষকেরা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করার পরিবর্তে গৃহস্থালির কাজে দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করতঃ 'The Peasants do not care for education and besides, they need their children to gather their betel-nuts, to row their boats and above all to herd their cattle.'[৩৩]

বরিশালঃ বাকেরগঞ্জ জেলার সবথেকে বড় শহর বরিশাল যা এ অঞ্চলের আদালতের প্রাণ কেন্দ্র। কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম তীরে গড়ে ওঠা এ শহরটি নদী পথে ঢাকা হতে ৭৫ মাইল দক্ষিণে এবং কলকাতা হতে ১৮৩ মাইল পূর্বে অবস্থিত। নদীই ছিল এ শহরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম, ঢাকা হতে ৩ দিন এবং কলকাতা হতে ৪-৭ দিন এ জেলায় পৌঁছাতে সময় লাগত। মোঘল আমলে এ জেলাটি লবণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চৌকি যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত লবণ শুল্ক প্রদান করা হত। এ শহরটি ৫টি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিলঃ বরিশাল, বগুড়া, আমানাতগঞ্জ, আলিকান্দি, এবং কাওনিয়া। এ গ্রামসমূহের মধ্যে বরিশাল ছিল সবথেকে ছোট, আয়তন ৬ বর্গ মাইল, যেখানে ছিল সরকারি সকল অফিস-আদালাত। এ শহরের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৩৩৩২ জন যার অর্ধেকেরও বেশি ছিল মুসলমান, বাকি অর্ধেক হিন্দু তবে খ্রিস্টান ছিল ১৫০। তৎকালিন বরিশাল শহরে ছিল ১টি ইংলিশ চার্চ, একটি ব্রহ্মসমাজ মিটিং হাউস, ৩টি আখড়া (২টি মদন মোহন, ১টি জগন্নাথের এর মধ্যে ৫টি কালিবাড়ি ও ৫টি মনসা)। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানেদের জন্য ছিল মাত্র একটি মসজিদ ও ৪টি সাধারণ নামাজের স্থান।[৩৪] এছাড়াও ছিল একটি দাতব্য চিকিৎসালয় (১৮৪৭), একটি পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৫), একটি দিওয়ানি ও ফৌজদারি জেলখানা, একটি ইংরেজি বিদ্যালয়, একটি দেশিয় বিদ্যালয়, একটি সাধারণ বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি বা দু'টি পাঠশালা, দু'টি ছাপাখানা (পূর্ণা চন্দ্রদাই ও সত্যপ্রকাশ)। এ সময়

বরিশাল শহরে ৪টি খবরের কাগজ বের হত; ১. বরিশাল বার্তাবাহ, ২. হিটসাদিনি, ৩. বালারঞ্জিকা, এবং ৪. সত্যপ্রকাশ। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারিদের জন্য একটি করে মোট ৩টি (মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিস্টান) সমাধি ক্ষেত্র। এ শহরটি পরিচালিত হত ১৮৬৮ সালে প্রণিত ৬নং আইনের মাধ্যমে গঠিত একটি কমিটি দ্বারা। বিভিন্ন উৎস (গৃহ কর ও খামার কর) হতে অর্জিত আয় দ্বারা এ কমিটির ব্যয় নির্বাহ হত। এ কমিটির বার্ষিক আয় ছিল মোট ৭০০০ রুপি যার মধ্যে ৬০০০ রুপি আয় হত গৃহ কর হতে (মাসিক কর ছিল ৩ আনা)। বরিশাল শহরে গৃহের নিম্নোক্ত তালিকা পাওয়া যায়:

সন	গৃহ
১৮১৪	৫২২
১৮১৯	৩৭৮
১৮২০	১৩১৬
১৮২৬	৫৬৪

সূত্র: H. Beveridge, *The District of Bakarganj: Its History and Statistics*, (London: Trubner & Co., 1876), 329-330.

উপসংহার: বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগ ঐতিহাসিকভাবে বাকেরগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল যা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে খাদ্য-শষ্য উৎপাদনে শুধু তৎকালিন পূর্ব বাংলা নয় বরং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ছিল প্রসিদ্ধ। এ জেলার উৎপাদিত খাদ্য-শষ্য কলকাতা বন্দর হয়ে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ত ফলে এ অঞ্চলের কৃষক মহল স্থানীয় জমিদার থেকে ছিল সুখী ও সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলের খাদ্য শষ্যের প্রাচূর্যতার জন্য ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন ব্যবসা বাণিজ্যের লক্ষ্যে এখানে আগমন করতো যা বাকেরগঞ্জকে একটি স্থানীয় বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। এছাড়াও বাকেরগঞ্জের প্রতিটি বাড়ি ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সংসার পরিচালনার জন্য প্রায় প্রতিটি জিনিসই নিজেরাই উৎপন্ন করতো। এই অসাধারণ সমৃদ্ধি বিদেশি বণিকদের এ অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য আগ্রহী করে তুলেছিল। বিশেষ করে ইংরেজ এ অঞ্চলের ক্ষমতা দখলের পর স্থানীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন করে বিদেশি পণ্যের তথা ম্যানচেস্টার হতে আমদানি করা পণ্যের বাজারে পরিণত করে। এছাড়াও ইংরেজদের অধিক মুনাফা লাভের বাসনা ও তাদের নিপীড়নমূলক আইন এ দেশীয় অর্থনীতির সমাজ ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল।

টীকা ও তথ্যসূত্র

---

১ Janet Beveridge, *Beveridge and His Plan*, (London: Hodder and toughton, 1954), 13.

২ Janet Beveridge, *Ibid*.

৩ Ghulam Husain Salim, *Riyazus Salatin*, (Calcutta: Baptist Mission Press, 1902), 41, 49.

৪ Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, vol., II, (Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1949), 135-136.

৫ *District Gazetteer, Bakerganj*, (Dacca: Bangladesh Government Press, 1981), 33.
৬ H. Beveridge, *The District of Bakarganj: Its History and Statistics*, (London: Trubner & Co., 1876), 38-40.
৭ H. Beveridge, *op., cit.*, 7.
৮ Ghulam Husain Salim, *Ibid.*, 3, 4, 288.
৯ H. Beveridge, *op., cit.*, 4-7.
১০ H. Beveridge, *op., cit.*, 189.
১১ H. Beveridge, *op., cit.*, 1-2.
১২ এ প্রতিবেদনটি ১৮১২ সনে House of Commons এর পঞ্চম প্রতিবেদনে (Fifth Report) পরিশিষ্ট ৪ এ প্রকাশিত হয়েছিল।
১৩ H. Beveridge, *op., cit.*, 44-45.
১৪ ঢাকা জালালপুর ও ঢাকা পৃথক দুটি প্রশাসনিক ইউনিট, প্রতিটি ইউনিটের জন্য ছিল পৃথক পৃথক দিওয়ানি আদালাত। এ প্রশাসনিক ইউনিট দুটি ১৮৩৩ সনের আইনের ৫ নং বিধি অনুযায়ী একত্রিত করা হয়।
১৫ H. Beveridge, *op., cit.*, 49.
১৬ H. Beveridge, *op., cit.*, 163.
১৭ H. Beveridge, *op., cit.*, 169.
১৮ তখনকার ভূমি ব্যাবস্থাপনায় কারসাদার ছিল প্রান্তিক পর্যায়ের চাষী, এদেরকে আধুনিক বর্গাচাষীও বলা যেতে পারে। এ চাষীগণ বংশানুক্রমিক (মিরাস কারসাদার) ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ায়ও ভূমি ব্যাবহার করত।
১৯ H. Beveridge, *op., cit.*, 174-175.
২০ H. Beveridge, *op., cit.*, 177.
২১ H. Beveridge, *op., cit.*, 178-180.
২২ H. Beveridge, *op., cit.*, 187-188.
২৩ H. Beveridge, *op., cit.*, 190.
২৪ H. Beveridge, *op., cit.*, 195-238.
২৫ H. Beveridge, *op., cit.*, 192.
২৬ H. Beveridge, *op., cit.*, 247-252.
২৭ H. Beveridge, *op., cit.*, 251.
২৮ H. Beveridge, *op., cit.*, 253-254.
২৯ H. Beveridge, *op., cit.*, 267-269.
৩০ H. Beveridge, *op., cit.*, 278.
৩১ H. Beveridge, *op., cit.*, 277.
৩২ H. Beveridge, *op., cit.*, 317-318.
৩৩ H. Beveridge, *op., cit.*, 318.
৩৪ H. Beveridge, *op., cit.*, 327-328.